উত্তর পুরুষ

সুজিত দাশগুপ্ত

আজকে একটি খবর পড়ে মন খুব চঞ্চল হয়েছে। কিন্তু এ কথাও ওর মনে হল যে চামচে গাছের তলায় দাঁড়াতে পারল না বলে এ জীবনে ওর আর কিছুই হল না। প্রতিপত্তি লাভ হল না। একথা ওর মনে হয়। অনেক সময় আবার একথাও মনে হয় যে চামচে গাছের তলায় দাঁড়ানোর অবস্থাতেও ও নেই। অন্তত মনের দিক থেকে। কেননা ওখানে দাঁড়াতে হলে একটা বিশেষ ধরনের যোগ্যতা দরকার হয়। শোভনের তা কখনও ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে ও এখন এখানে, এই মহাকরণেই। রোজ আসে দশটার আগে। সাড়ে পাঁচটায় বের হয়। কোনও কোনও দিন ছ'টা সাড়ে ছ'টায়। কখনও তারও পরে অফিসের কাজে এখানেই আটকে থাকে।

বিকাশকে এইসব কথা বলতে ইচ্ছে করে। বিকাশ খুব বন্ধু ছিল। এখন মনে হয় ও যেন ছিল আত্মার আত্মীয়। কথা যে খুব হত তা নয়। কিন্তু প্রিয় ছিল একে অপরের। সেই বিকাশকে চামচে গাছের কথা বলা যেত। এই মহাকরণের কথা। একদিন এই কলকাতায় রামধনু দেখা গেছিল। সেই কথা। চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনালের ওপাশ জুড়ে খানিক তার, এক চতুর্থাংশ উঁকি দিয়েছিল। গত বর্ষায়। প্রায় সান্ধ্য সমাগমে ও তখন উইলিস জিপে ফিরছিল। একটা প্রেস মিট অ্যাটেন্ড করে। বিকাশকে বলা হল না, বিকাশ, এইরকম এক শহরে যা দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব আজ এখানে সেই রামধনু দেখা গেছে। আজ বাতাস ছিল মনোরম। মৃদু মন্দ। পশ্চিম আকাশে লেগেছিল ফিকে লাল আভা। বিকাশকে এসব কথা বলা হল না।

বিকাশের সেই যে ছিল একটা এস্রাজ, মাঝে মাঝে মনে হয় এই ধরিত্রীর কোনও কোণায় নয়, এই বিশাল আকাশের পটে, ধরা যাক কিনা ওই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক'এর মাথার ওপর জুড়ে কোথাও বিকাশ আসন পেতেছে। আর বাজাচ্ছে সেই কোমল সুরেলা সুর, তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই...। পাশে আয়েসে শরীর এলিয়ে শুয়ে শোভন সেই সুর শুনছে। সময় বয়ে যাচ্ছে, যাক। দূরে উধাও হোক মেকি কথার কল্লোলিনী তিলোত্তমা নাম। আদিগন্ত স্বপ্নে ছাওয়া শিলিগুড়ির সেই জ্যোৎস্না নামুক এখন এই এখানে। এখনই।

বিকাশ বাজাচ্ছে আর শোভন শুনছে, এমনটা আর কখনও হবার নয়। হবে না। আজকাল সেই দিনগুলিকে স্বপ্ন মনে হয়। অবশ্য এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা এমনই এক দৌড়ঝাঁপ এবং ব্যস্ততার শহরে ও এসে পড়েছে যে এখানে কোনও অবকাশই নেই। যে মফস্বল শহরে ও থাকে ঠিক সময়ে অফিসে আসতে হলে বাড়ি থেকে আটটা দশ পনেরর মধ্যে বেরতেই হয়।

আজকেও শোভন সেই সময়েই বেরিয়েছে। আটটা চল্লিশের লোকাল ধরে শিয়ালদায় এসেছে ন'টা কুড়িতে। তারপর বাসে রাইটার্স বিল্ডিংস। পৌনে দশটায়। ন'টা দুয়ের লোকালে এলে অফিসে ঢুকতে দশটা দশ পনেরো হয়ে যায়। আর কখনও যদি তারও চেয়ে দেরি হয় তো সে এক বিচ্ছিরি টেনশনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অতএব আটটা চল্লিশের ট্রেনই ভাল।

তখন এগারোটা। ঝকঝকে শীতের রোদ্দুর। আয়েসি শীত। অফিসে এসেই শোভনকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। বিধান রায়ের স্ট্যাচুর পাশেই গ্যারেজ। সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে প্রেস ক্লাবে যেতে হবে। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বেরিয়ে আসতে যেটুকু সময় লাগে তারই মধ্যে যেন চারদিক সচকিত হল। ইতিমধ্যে মহাকরণের সামনের ফুটপাথে ফেয়ারলির দিকে যাওয়া অফিস যাত্রীদের পুলিস আটকে দিয়েছে। সাদা প্যান্টের ভিতর সাদা জামা গোঁজা নারী পুলিসরা হঠাৎ বুক চিতিয়ে

Want to Download More Books

Go to http://doridro.com

দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্য পুলিসরাও তখন সসস্ত্রমে অ্যাটেনশন, নাকি ভীত সন্ত্রস্ত বোঝা গেল না। হঠাৎ একজন পুলিস চিৎকার করে কী যেন বলল। বোধহয় কোনও অঙ্গীকার করা হল। ভাষা হিন্দি। এবং এত দ্রুত বলা যে বোঝা গেল না। ওই অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গে সাঁ সাঁ করে একের পর এক গাড়ি এল। পাইলট কারটা যান্ত্রিক চিৎকার করতে করতে এধারে চলে এল। সি এম'এর গাড়ির আগে এবং পিছন পিছন আরও গাড়ি ঢুকল।

যেন মুহূর্তে ঘটল। তারপরই সব আবার আগের মতো। পুলিসরা হাঁফ ছেড়ে দাঁড়াল। ছেড়ে দিল দুপারের ফুটপাত। দেরি করে ফেলা অফিসযাত্রীরা, যারা ফেয়ারলির দিকে যাবে তারা মহাকরণের প্রধান গেট অতি দ্রুত পার হয়ে গেল। মহাকরণের মাথায়, প্রায় বিল্ডিং'এর কপালের মাঝ বরাবর লেখা আছে জাস্টিস, কমার্স, সাইন্স, এগ্রিকালচার এবং বসে অথবা দাঁড়িয়ে আছে কটি মূর্তি। বেশবাসের ধরনে গ্রিক কেতা। যেন এরা ওই কথাগুলির অনন্য প্রতীক হয়ে আয়েসে স্থবির হতে হতে স্থবিরতার অনন্য সাধক এখন। তাকিয়ে আছে কোন্ নবদিগন্তের দিকে কে জানে!

ওই নতুন কলি ফেরানো মহাকরণ, এই ঝকঝকে শোভন পথ, জি পি ও'র সাদা গম্বুজ আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক'এর বিশাল বাড়িটার অটল দৃঢ়তার দিকে তাকিয়ে শোভনের মনে হল, বাঃ কী অসাধারণ!.... এইরকম এক সুন্দর দিনে আমি যদি অন্তত একটা দিনের জন্যও মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতাম! ও হো, পাইলট কারটা এইভাবে আমার আগে আগে চলে যেত যদি! এইভাবে হুঁশিয়ারি দিয়ে, সাবধান করে যেত যদি! বিকাশ, একটা দিনও কি এইরকম হতে পারত না!

শোভনের কখনও কখনও এইরকম মনে হয়। যা কিছু অসম্ভব, হবার নয়, শোভনের মনে হয় সেটাই যদি হওয়া যেত তো বেশ হত। আর এইসব ভাবনার বিনিময় হয় ওই বিকাশের সঙ্গে। একতরফা ভাবেই। কেননা বিকাশ তো কিছুই জানতেও পারে না। অথচ শোভন তাকে বলে, দেখুন কাণ্ড, পৃথিবী পড়ে রইল তার নিজের নিয়মের গণ্ডিতে। তিস্তা অথবা কালজানি সেই বহুদূরের প্রকৃতির অংশ হয়ে বয়ে চলেছে। যেখানে মানুষ গল্প করছে অথবা কাজে ব্যস্ত আছে, তারাও কেউ জানে না এইমাত্র এই রাজ্যের সব সেরা ক্ষমতাবান পুরুষ তাঁর কর্মক্ষেত্রে এলেন।

মানুষ জানে না, নদী জানে না, পাহাড় সমুদ্র বনভূমি কেউ জানে না। জানতে চায় না। প্রয়োজনও নেই। তবু একজন পুলিস হঠাৎ চিৎকার করে প্রতিদিন কী যেন অঙ্গীকার করে। নাকি হুঁশিয়ারি দেয়, কে জানে! রাজা আসে, রাজা যায় অথচ তিস্তার কিংবা হাটুরে মানুষের কিছুই যায় আসে না। শোভনের মনে তিস্তা কিংবা উত্তর বাংলার পটভূমি উঁকি দেওয়ার একটাই কারণ। তা হল উত্তর বাংলায় ও অনেককাল কাটিয়ে এসেছে। বিকাশকেও রেখে এসেছে ওই ওখানেই।

চামচে মানে অনুগত। চামচে মানে বশংবদ। চামচা মানে ফেক খাটে যে সেই মানুষ। কিন্তু চামচে গাছ আসলে একটা সোঁদাল গাছ। অনেকে আবার বাঁদর লাঠি গাছও বলে। ওরই তলায় বসে থাকে কিছু পুলিস। ইতি, উতি দু'চারজন মহাকরণের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আসলে ওরা কখন ওপর থেকে ডাক আসবে সেই অপেক্ষায় থাকে। ওই দোতলায় ঘরে ঘরে সারি সারি ক্ষমতাবান পুরুষ। কেউ আমলা, কেউ সি এ, কেউ পি এ, আর মন্ত্রীরা তো আছেনই। সেই দোতলার করিডর থেকে হাতছানিতে ডাকে কেউ। কেউ নীচে নেমে আসে। আর এদিকে যারা অপেক্ষায় থাকে তাদেরও কি প্রয়োজনের শেষ থাকে! কারো ঘরে রোগী, উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য সহযোগিতা দরকার। কেউ রাজনৈতিক রেষারেষির শিকার। কেউ পাড়ার ক্লাবের অন্যায় অত্যাচারের কবলে পড়েছে। কেউ হয়তো স্বামীর অত্যাচারে ঘরছাড়া। এইরকম হাজারো সমস্যা নিয়ে সেন্ট্রাল গেটের সামনে দাঁড়ায় যারা তারা কেউই সেই অর্থে চামচা নয়।

অবশ্য তেমন বশংবদ ফেকলু লোকজন কেউ যে আসেন না, একথা এত জোর দিয়ে বলা যাবে না। আসতেও পারে। মহাকরণের দিকে গাড়ি বেরিয়ে বাঁক নেওয়ার মুখে শোভন ওই গাছের দিকে এক পলক তাকায়। মানুষের যত কাণ্ড। চামচে গাছ। কি বিচিত্র নাম। ওর তলায় ওকে যেন কখনও কোনওদিন দাঁড়াতে না হয়।

২

চব্বিশে নভেম্বরের রাতকে কেউ কেউ কালো রাত মনে করতে পারে। কালকের রাত ছিল চব্বিশে নভেম্বর। কিন্তু ওভাবে কেন ভাবা হবে। ওইভাবে যাতে ভাবা না হয় সেইজন্য আগেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে যদি সূর্য ওঠার থাকে তবে সেই সূর্য এর পরেই উঠবে। দশদিক আলোকিত মধুময় দিন হবে এর পরেই। এই কথা ভেবেই হয়তো একটা গালভারী সুন্দর নাম রাখা হয়েছিল। 'অপারেশন সানসাইন'। এই দুই শব্দকে নিয়ে লোফালুফি করে খেলতে চেয়েছে অনেকে। অমলেশ তাদের কেউ না, ও নেহাৎই একজন রিপোর্টার। তবু ওর প্রফেশনের একটা তীর্যক দিক আছে। ওর গলায় যেন দানা দানা হয়ে গড়িয়ে পড়েছিল সেই বাঁকা প্রশ্নের হাসি। ফোনের একদিকে অমলেশ। একটা বিখ্যাত দৈনিকের সাংবাদিক। অন্যদিকে সুপ্রিয় রায়। সুপ্রিয় পি আর ও, অপারেশন সানসাইন। শোভনের সহকর্মী আধিকারিক।

কিন্তু এভাবে বললে সুপ্রিয়র কথা কিছুই বলা হয় না। সুপ্রিয়কে চেনে না, এই শহরে তেমন ক্ষমতাবান কেউ যেমন নেই তেমনি কোনও সরকারি দপ্তরে কোনও উচ্চতম আধিকারিক সুপ্রিয়র কোনও চাওয়াকে নস্যাৎ করে দেবে এও ভাবা যায় না। এ যে কীভাবে হল, বলা খুব মুশকিল। কিন্তু ওই র‍্যাপো বলে একটা শব্দ খুব চালু আছে ভদ্রমহলে। সুপ্রিয়র যত ক্ষমতা বোধহয় একটা শব্দের মধ্যে লুকোনো। তাই অপারেশন সানসাইনের আগে পি আর ও হিসেবে উচ্চমহলের বিবেচনায় সুপ্রিয় রায়ের নামই সবার আগে নির্বাচিত হল। ফোন ধরতেই অমলেশ বলল, হ্যালো, কে সুপ্রিয়দা?—

—হ্যাঁ বলছি।—

—যদি কিছু বলেন।—

—কী বলব ভাই।—

আহা ন্যাকা, কী বলবে জানে না। এই শেষ রাতে কী প্রশ্ন থাকতে পারে! এই রাগ লুকিয়ে অমলেশ বলল, আপনাদের অপারেশন সানশাইন হল?—

—ও ইয়েস, সাকসেসফুলি ডান।... একটু আগে ফিরেছি।—

—তা ইয়ে... কেমন হল দাদা?—

—ওই যে বললাম, সাকসেসফুলি ডান।—

—সাসসেসফুলি ডান! সেটা কী রকম দাদা?..... মালপত্র কিছু বাজেয়াপ্ত করলেন?.... এনি আনটুয়ার্ডস ইনসিডেন্টস, কোনও গ্রেপ্তার, মিস হ্যাপস ইত্যাদি?—

—মালপত্র কিছু বাজেয়াপ্ত হতেও পারে, ভাল জানি না। তবে কোনও প্রতিরোধ ট্রতিরোধ হয়নি। পুলিসকে সেই অর্থে কোনও বড় অ্যাকশন কিছুই নিতে হয়নি।—

এই হল পি আর ও। অবাঞ্ছিত প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া। মিডিয়ার কাছে কিছু না বলা, কিন্তু প্রয়োজনে মিডিয়াকে আ তু তু বলে ডেকে নেওয়ার ক্ষমতা বজায় রাখাই পি আর ও'র কাজ। অমলেশ দেখল এখান থেকে খবর কিছুই বেরুবে না। তেমন আশাও ছিল না। সুপ্রিয় রায় কী বলতে পারে অমলেশের মোটামুটি একটা ধারণা ছিল। তবু হঠাৎ বেফাঁস কিছু যদি বেরিয়ে পড়ে, তাই এই ফোন। নয়তো ওর ঝুলিতে যা খবর আছে তা দিয়ে একটা মুচমুচে স্টোরি ভালই টেনে দেওয়া যাবে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ চাই। সঙ্গে ছবি। তবে স্টোরির বিষয় তৈরি। অমলেশ হেসে বলল, এটা তো একটা গ্লোরিয়াস অ্যাচিভমেন্ট, সুপ্রিয়দা?—

—নিশ্চয়।—

'কোনোও প্রতিরোধ নেই... কাউকে গ্রেপ্তার করতে হল না.... অ্যাজ ইফ সরকারকে সবাই হেল্প করতেই বসেছিল.... কী বলেন?— এ কথার উত্তরে সুপ্রিয় খানিক চুপ করে থেকে গলা নামিয়ে বলল, তুমি কি ব্যঙ্গ করছ?—

—আরে না না, কী বলছেন.... ব্যঙ্গ করব আমি!.... একজন চুনোপুটি রিপোর্টার!.... সে যাক। সূর্য এবার উঠবেই, কী বলেন... হাঃ হাঃ....।— এ কথার উত্তরে সুপ্রিয় ফোনটা ছেড়ে দিয়ে বলল, ইডিয়েট.... যতসব।—

হাতের পয়েন্ট ডট কোয়ার্টজ ঘড়িটা বলছে সময় এখন তিনটে পঁয়ত্রিশ। অ্যাকশন যখন শেষ পর্বে তখন কোনও মতে সুপ্রিয় চলে আসতে পেরেছে। ইচ্ছে ছিল এখন এই সোফায় অন্তত ঘণ্টা দুয়েকের যাকে বলে একটা গ্যাপ, কিন্তু তা আর হবার নয়। কেননা মাথা ধরে বসে আছে। হয়ত অতিরিক্ত সিগারেট এর জন্য দায়ী। এও হতে পারে মূল কারণ ওই তীব্র মেটাল ল্যাম্পের আলো। সেই আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। এদিকে এখন হাই উঠছে। চোখ জ্বালা করছে।

কার্যকারণে এই ঘটনার সঙ্গে সুপ্রিয় জড়িয়ে পড়েছে বটে কিন্তু না জড়াতে পারলেই ভাল হত। সেই চেষ্টা ও করেও ছিল। কিন্তু ওপর মহলের নির্দেশ উপেক্ষা করা কি সোজা কথা! আসলে এতকাল ঝাঁপ দিয়ে একের পর এক গুরুতর কাজ উদ্ধার করে ফেলার পরে প্রায় সব মহলেই ওর একটা বিশেষ প্রতিপত্তি জন্মেছে। কাজগুলিও বিচিত্র। উত্তর কানাডার প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা দেওয়া, নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীর হাতে কলকাতার চাবি তুলে দেওয়া অথবা অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ইত্যাদি নানান সরকারী ক্রিয়াকর্মের ব্যবস্থা করার সব দায়িত্ব সুপ্রিয়র। ফলে সবার মনেই পি আর ও হিসাবে প্রথম যার কথা মনে আসে সে হল এই সুপ্রিয় রায়।

সুপ্রিয় একটু জোরের সঙ্গেই বলেছিল, ওইদিন স্যার আমার পক্ষে অসম্ভব।—

পুলিসের সর্বময় কর্তা হেসে একটু বাঁকা চোখে তাকিয়েছিলেন। তারপর কিছু না বলে একটা ফোন করলেন। ঘরে তখন আরও পাঁচজন হাজির। সবাই তাঁর নির্দেশ শোনার অপেক্ষাতেই বসে আছে। সুপ্রিয়ও। তবু ওর বসার ধরনে আয়েসি ভঙ্গিমা। একটা সিগারেট ধরাল এমনভাবে যেন সবাইকে ও আসলে উপেক্ষাই করতে চায়। বড় কর্তা ফোনটা রেখে বললেন, আপনার ডিকশনারিতে ওইরকম একটা শব্দ আছে নাকি!—

—কেন স্যার থাকতে নেই!—

বড় কর্তা মনে মনে একটা হিসাব করলেন। কথাটা বলবেন! নাঃ থাক। চাকরি শেষ হয়ে এসেছে, এই বয়সে এইসব পাঁকাল মাছের কাঁটা খাওয়ার কী দরকার! অবশ্য অত একটা পরোয়া করারও কিছু নেই। কী করবে ও! যাদের কান ভরাট করে করুক। উনি তাই স্বর একটু কোমল করার চেষ্টা করে বললেন, আগের গভর্নমেন্টের আমলেও আপনি ছিলেন আনস্পেয়ারেবল, এই আমলেও তাই।.... আপনাকে ছাড়া মনে হয় যেন সবাই কানা,.... এই মানুষদের ডিক্সনারিতে অসম্ভব বলে কোনও শব্দ থাকতে পারে! আপনি বলছেন!—

এই কথার যেন কোনও উত্তরই হয় না। এতগুলি লোকের সামনে এইভাবে এইকথা বলা কি ঠিক! সুপ্রিয় একটা শ্রাগ করে বলল, বলুন... বলার সুযোগ পেয়েছেন, কেন বলবেন না?—

বড় কর্তা ওর এই তরল করার চেষ্টাকে একটুও প্রশ্রয় না দিয়ে বললেন, আপনাকে থাকতেই হবে, উপায় নেই।—

খুব যে দরকার ছিল তা নয়, কিন্তু একে একটা রাত আটকে রাখতে পারাই আনন্দ। আনন্দ অন্য কারণে নয়, আনন্দ এই কারণে যে এর কান দিয়ে বড় কর্তারা সব কথা শুনবেন কেন। আর যদি শুনবেনই তো শুনুন। তিনি যেন বিরক্ত হয়েছেন এই ভাব করে বললেন, জানেন তো গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টের কোনও ব্যক্তিগত জীবন থাকতে নেই?—

সুপ্রিয় লোকটাকে ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করল। ব্যাপার যা, সেখানে ওর থাকা খুব জরুরী নয়। কিন্তু মনে হচ্ছে লোকটা কোনও কারণে আজকে একটু অ্যাডামেন্ট হয়েছে। কী এর কারণ, সুপ্রিয় ভাল বুঝতে পারল না। বলল, ঠিক আছে, আপনি যখন চাইছেন, তখন থাকব।.... আসলে পরদিন সকালে আমার বাবার শ্রাদ্ধ।—

এ কথায় সর্বময় কর্তা অবাক হলেন। কিন্তু খুবই রাশভারী মানুষ প্রয়োজনে বিস্ময় হতাশা রাগ ক্ষোভ সবই গোপন করার একটা ক্ষমতা রাখে। তিনি সেই গোত্রের। সুপ্রিয় যেমন সহজে কথাটা বলল তিনিও তেমনি সহজে বললেন, ও।... আপনাকে দেখে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আপনিই কি শ্রাদ্ধে বসবেন?—

—না। আমার ব্যস্ততার জন্য কোনও নিয়ম মানতে পারিনি। ভাই করবে।—

—তবে তো ঠিক আছে। আপনার আর অসুবিধা কোথায়?—

হ্যাঁ,একথা ঠিক যে সুপ্রিয়কে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। কেননা ও একই নিয়মে অফিসে গেছে। শোকের চিহ্ন কিছু গায়ে রাখেনি। এবং সবাইকে বুঝিয়েছে যে ওর মতো ব্যস্ত মানুষদের ওইসব নিয়ম মানা অসম্ভব। যদিও মানা যেত। তেমন কোনও অসুবিধে ছিল না। কিন্তু না, সুপ্রিয়র জন্য ওসব না। কেননা প্রায়ই এটা সেটা গুরুতর কারণে ওপরওয়ালার কথায় দৌড়ঝাঁপ করবে কে!

এখন রাত ভোর হলেই এই বাড়িতে একটা শোকের অনুষ্ঠান। হ্যাঁ শোক। বাবার বয়স হয়েছিল নব্বই'এর কাছে। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে শোকেও রঙ চড়ানো দুঃখ দেখানোর ব্যাপার থাকে। নিজেদের ঐতিহ্য বনেদিয়ানা এবং প্রতিপত্তি দেখানোরও ব্যাপার থাকে। আমন্ত্রণ পত্র থেকে তার শুরু। সম্পূর্ণ হবে সেই মৎসমুখীর রাতে।

সিল্ক স্ক্রিনে ছাপা কালো আমন্ত্রণ পত্রে গঙ্গা কিংবা তিলজল কোশাকুশি এসব কিছুই ছিল না। ছিল একটা উদ্ধৃতি। ঔপনিষদিক বাণী। 'হন্তা চৈন্মন্যতে হন্তং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে'

এরপরে ছাপা ছিল 'রায় সীতারাম অমৃতধাম যাত্রী। গত ১২ই। তাঁকে আমাদের প্রণাম।' এরপরে শোকাহত, হতভাগ্য এসব কিছুই নয়। শুধুই কটা নাম। ছেলেদের। পুত্রবধু ও নাতি নাতনিদের। এই আমন্ত্রণ পত্রের, সুপ্রিয়র কথায় প্রজ্ঞাপনের সমস্ত ভাবনাই ছিল সুপ্রিয়র নিজের। উপনিষদের উদ্ধৃতিটা নিজেই খুঁজে খুঁজে কঠোপনিষদ থেকে সংগ্রহ করেছিল।

এখন ভেতর বাড়িতে গোছগাছ সম্পূর্ণ। বাড়ির বাইরের অংশে ধবধবে সাদা কাপড় বাঁশের গায়ে ঠুকে লাগানোর কাজ চলছে। এই সময়ে এই কাজ মানেই ওরা আর সামলাতে পারেনি। বাঁশ বেঁধে গেছে একদিন আগে। কিন্তু তারপরে ত্রিপল টাঙিয়ে সাদা কাপড়ের কারিকুরি, সঠিক ভাঁজের ডিজাইনে যেমনটা করতে বলা হয়েছে তেমনি করতে সারাটা দিন লাগিয়ে দিয়েছে। সুপ্রিয় ঢোকার মুখে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বলেছিল, তোরা যে কী করিস না, এখন সামলাতে পারবি? সকাল হলেই তো অজস্র লোকের ভিড় লেগে যাবে.... কী করবি তখন?—

হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। দেখবেন, আর ঠিক দু'ঘণ্টা। এর মধ্যেই সব কমপ্লিট হয়ে যাবে।

যে ছেলেটি টিউবলাইট সঠিক পয়েন্টে লাগাচ্ছিল সেই বলল কথাটা। ছেলেটা কাঠের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। অবশ্য ছেলে বললে ভুল হয়। পঁচিশ ছাব্বিশের ছিপছিপে, কিন্তু শক্ত সামর্থ চেহারা। তলায় ওরই মতন আর একজন। এই শীতে গায়ে একটা পাতলা সোয়েটার। কিন্তু কান মাথা মাফলারে জড়ানো। হাতে আড়াল করে ধরা সিগারেট। মাঝে মাঝে হাতটা অল্প অল্প নাড়ছে যাতে ধোঁয়া দেখা না যায়।

সুপ্রিয়র গায়ে কোট। বুকে টাই ঝুলছে। ও খুব কড়া স্বরে বলল, এই এত রাতে আওয়াজ হয় না, লোকের অসুবিধা হয় না? সারাদিন কোথায় ছিলি?

এ কথার উত্তর কেউ দিল না। কেননা সারাদিন কাজ হয়েছে। অতএব কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ভেতর বাড়িতে, বাড়ির ছাদে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। আলোর ব্যবস্থা হয়েছে। সেসব পরিপাটি করে সারতে সারাটা দিন লেগেছে। কেউ কিছু বলছে না দেখে সুপ্রিয়র ভেতরের অহং হঠাৎ যেন প্রবলভাবে ফেটে পড়তে চাইল। ও গলা চড়িয়ে বলল, কী রে বলছিস না যে?—

এইবারে একজন মুখ খুলল। বলল, নতুন কাপড় ছিল না। তাছাড়া অভয়দা ভায়ের দোকান সামলানোর জন্য সারাদিন হাতিবাগানে ছিল। সেখান থেকে মাল সরাতে হয়েছে।—

—কেন সেখানে আবার কী হল?

—কেন জানেন না অপারেশন সানশাইনের কথা? সেখানে তো সত্যদার দোকান। ফুটে। পুলিস সব ভেঙে চুরে নিয়ে যাবে, তখন কী হবে? পেটে লাথি পড়বে না?

এ কথার উত্তরে সুপ্রিয় আর কিছুই বলল না। ওর মনে হল আর কোনও কথা বলার কোনও মানেই হয় না। লোকটাও উত্তর দিল এমনভাবে যেন এবার উলটে চার্জ করবে বলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আসলে পরিবেশ সব সময় অনুকূল থাকা চাই। তবেই ভেতরের মানুষ সঠিকভাবে গর্জন করতে পারে। যেমন ওর অফিসে সুপ্রিয়ই বস। ওর দৌড়ঝাঁপ, ব্যস্ততা, বড় মানুষদের সঙ্গে ওঠাবসা দেখে ওর কর্মচারীরা সব সময়ই তটস্থ। সেখানে ও যেন দি লর্ড। এই প্রগতিশীল সরকারের প্রতি প্রগতিশীল কর্মচারীরাও চুনোপুঁটি। কিন্তু এরা তো ওর কর্মচারী নয়। এখন হাত গুটিয়ে যদি চলে যায় তো হয়ে গেল। তার ওপর এমন একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলল যে ব্যাপারে কোনও উত্তর দেওয়াই বোকামি। সুপ্রিয় তাই কথা ঘোরানোর জন্য ওর বাবার ছবি যেখানে লাগানো হবে সেই জায়গাটা একবার ভালভাবে লক্ষ করে বলল, এইখানে আলো কীভাবে লাগাবি? একটা ফোকাস ল্যাম্প এনেছিস তো?

—হ্যাঁ, এনেছি।

—কেমন, কালো তো?.... বডিটা? দেখতে ছিমছাপ শৌখিন হওয়া চাই।

এ কথার উত্তরে লোকটা ল্যাম্পটা বের করে দেখাল। তারপর সুপ্রিয় এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে একটা সিগারেট ধরাল। কিন্তু তখন সিগারেটও ভাল লাগছে না। মুখের ভিতরের অবস্থা তেতো। জ্বালা ধরানো। ও সিগারেটটা ফেলে পায়ে পিষল। তারপর ভেতর বাড়িতে ঢুকল।

এই বাড়ি এঘর ওঘর উঠোন বারান্দা মিলিয়ে বিশাল। পুরনো দিনের বাড়ি। ঢোকার মুখে পুরনো দিনের বার দুয়োরের কায়দা। কাস্ট আয়রনের দুদিক খোলা বড় গেট। গেট দুটো আটকানো আছে চওড়া পিলারের গায়ে। ইঁটের গাঁথনির পিলার। ওপর দিয়ে বাঁকানো লোহার খাঁচা। আগে ওখানে খুব পুরনো একটা যুঁইগাছ ছিল এখন নেই। অতিথি যাঁরা তাঁরা ওই গেট পেরিয়ে বাইরে উঠোনে এসে বসবেন। ওইখানে একপাশে বাবার ছবির তলায় 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা...' ইত্যাদি লেখা থাকবে। ফুলে ফুলে ছবি ঢাকা পড়ে যাবে। যাবেই। হয়তো উদ্ধৃতিগুলিও ঢাকা পড়ে যাবে। কারণ শ্রাদ্ধবাসরে যারা যায় তারা ফুল নিয়ে যাবেই। যায়। তাই উদ্ধৃতিটা ঠিক কোন জায়গায়, কোন পজিশনে লাগালে ঠিক হয়! সুপ্রিয় ভেতরে যাওয়ার সময়ে এইকথা ভাবছিল।

এই বাড়িতেই সারাটা জীবন কেটে গেল। খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোনের সে ছিল এক হাট। এই বাড়ির চৌহদ্দির ভিতর খেলাধুলো, মারামারি, ঝগড়া এইসব করে সমস্ত শৈশব

কেটেছে। এই বাড়ির পাঁচিলের বাইরে যেতেই হয়নি প্রায়। পরে যখন ভাগ বাঁটোয়ারার বাড়াবাড়ি হল, সুপ্রিয়র মনে আছে বাপ জ্যাঠাদের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। হতে দেয়নি রাঙা কাকা। ব্যাচেলার ছিল। বাবার হাত চেপে ধরে এক ম্রিয়মান আলোর সন্ধ্যায় বলেছিল, এসব কী করছিস তোরা !—

বাবা তখন টলছে। রাগে। লাল মুখ। পাকানো গোঁফ। উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে বলেছিল, অ্যাই অ্যাম নট এন ইডিয়েট... ইউ সি, ইউ সি হোয়াট দে আর সেয়িং...।—

—আহা আহা অত চটছিস কেন ! উত্তেজনায় কে কী বলল সব ধরতে হয় নাকি.... তাছাড়া তোরা এরকম করলে ছেলেমেয়েগুলো সব দূরের হয়ে যাবে, সেটা কি ঠিক হবে ?—

এ কথায় বাবা যেন খানিক শান্ত হল। বলল, তুই কী বলতে চাস ?—

—তোরা শান্ত হ। হাঁড়ি তো আলাদা হয়েইছে, তারও পরে আর হইচই করে কী হবে বল? একসঙ্গে এক জায়গায় শান্ত হয়ে বসে যে যার হিসাব বুঝে নে, কিন্তু মুখ দেখা বন্ধ করিস না, কেউ যেন টের না পায়—

সেদিনও ওই স্টাফ করা হরিণের মাথাটা একই রকম করুণ লেগেছিল। আজও লাগছে। ওই দক্ষিণের দেওয়ালে। তাকিয়ে রয়েছে সেই সেদিনের মতো। তখন ছিল বাল্বের লালচে আলো। সেই আলোয় আড়াআড়ি কাঠের ওপর পেটাই ছাদটাকে মনে হয়েছিল ওটা যেন এখনি ঝুপ করে ভেঙে পড়বে। কেমন যেন বাকাভাব। এখানে ওখানে ক্ষয়া। চলতা ওঠা। চুনকাম বিবর্ণ হয়ে কোথাও কোথাও লাল ছোপ পড়েছে।

এ ঘরের চেহারা আজও সেই একইরকম। সেই ছাদ। সেই হরিণের মুখ। ছাদটা আজও ভেঙে পড়েনি। ঘরে লালচে আলোর বদলে টিউবলাইট জ্বলছে। তবে ইচ্ছে করলে ওই আলো এখনই জ্বালিয়ে দেওয়া যায়। সেই ঢেউ খেলানো সাদা শেডের তলায় একটা বাল্ব ঝুলছে। সুপ্রিয় একবার আলোটা জ্বালাবে ভেবেও জ্বালাল না। বাবা নেই। কাকা গত হয়েছেন বাবারও আগে।

কাকা এখানে থাকতেন না। ছিলেন এয়ার লাইন্সের গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার। সাহেব পাড়ায় একটা ফ্ল্যাটে থাকতেন। মাঝে মধ্যে আসতেন। পরেও কাকারই মতন সফল হয়েছে যারা তারা কেউ এ বাড়িতে থাকেনি। সুপ্রিয়ও। ও থাকে সল্টলেকে সরকারি আবাসনে। প্রয়োজনে আসে। আজ যেমন এসেছে।

এ ঘর পেরুলেই সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে একটা স্ট্যান্ড সহ এইয়া বড় সাদা চিনেমাটির টব। ওটা ছাপিয়ে ঝিরঝিরে লতা চারপাশে এক রেখায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। এখনও তাই আছে। ওই ঝিরঝিরে নামটা ন'কাকার। খুব সুন্দর ছিল। রঙ যেন এই ফেটে পড়ছে। টানা চোখ, ধারাল নাক। গয়না যা কিছু গলায় হাতে সব সময় থাকত, দেখলে ওই সোনার অলঙ্কার নাকি গায়ের রঙ কে কার জন্য সুন্দর বোঝা যেত না। ন'কাকি তখন বিয়ে হয়ে এসে একেবারে নতুন। ওই বউটা দেখে ভারী খুশি হয়ে বলেছিল, বাঃ এই ঝিরঝিরে লতাটা তো দেখতে ভারী সুন্দর।—

কে একজন তখন, ছোটরা কেউ হবে। আসল নামটা বলে দিয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিয়র মনে নেই। সিঁড়ির ওই শেষ মাথায় দাঁড়িয়েছিল বড় জ্যেঠি। তিনি বললেন, না আজ থেকে ওই লতার ওই নাম। তোমরা সবাই ওই নামই বলবে।

এই বাড়িতে এলে এইসব টুকরো স্মৃতি খুব মনে পড়ে। আর আজকে এই শেষ রাতে বাড়িটা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে এবং পেটেও নেই কোনও দামী পানীয়ের তীব্রতা তখন ওই স্মৃতিই যেন টেনে নিয়ে যাবে দূরের কোনও ভোরে।

সেজো কাকার একটা ভাগ বাঁটোয়ারার চুলচেরা হিসাবের ধরণ ছিল। সেইসব ভাগাভাগির দিনে ওই মাঝের উঠোনে সেজোকাকা পাঁচিল গেঁথে দিয়েছিল। কিন্তু পরদিন এইরকম এক ভোরে তিনি যখন দেখলেন যে পাঁচিল ভাঙা তখন তাঁর সে কী দাপাদাপি! উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে কী চিৎকার! সুপ্রিয়র মনে পড়ে ঘুম জড়ানো চোখে পেচ্ছাপ করতে উঠে কাকাকে ওইরকম করতে দেখে ও অবাক হয়ে গেছিল। বাঙালি তখনও ধুতি ছাড়েনি। উপরি কাকার গায়ে ছিল ফতুয়া। কাকার ঘুসি পাকিয়ে পাকিয়ে দেখানো এবং প্রবল চিৎকারের দমকে ফতুয়া ফেটে ভুঁড়িটা প্রায় বেরিয়ে পড়তে চাইছিল। ওই উঠোনের দিকে তাকিয়ে সুপ্রিয় এক মুহূর্ত ভাবল, সো হোয়াট!.... দ্য ডেজ হ্যাড গন.... বাট উই আর নট অ্যালোন টিল নাউ....।—

পাঁচিলটা বাবাই ভেঙে দিয়েছিল। বাবার তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। ব্রিটিশের রাজত্বে বাবা জাঁদরেল পুলিস অফিসার। কারও পরোয়া করত না। সুপ্রিয়র মনে আছে, বাবা হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে এসে দোতলার ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওই আধো অন্ধকারে আঙুল তুলে বলেছিল, সোমেশ, খুব সাবধান... আর একটা কথা বলবি না... ঘরে যা। বাবার সেই গম্ভীর স্বরে কী জাদু ছিল কে জানে কাকা সব হইচই থামিয়ে চুপচাপ ঘরে চলে গেছিল। সেইদিন থেকে বাবাই ছিল সুপ্রিয়র কাছে সব সেরা নায়ক। আজ বাবার শ্রাদ্ধ। সুপ্রিয় বাবার শ্রাদ্ধের কাজে বসবে না বটে কিন্তু ও জানে ও বাবাকে খুব ভালবাসে।

৩

সুপ্রিয়র কাছে খবর তেমন কিছু পাওয়া গেল না বটে তবু যতটা সম্ভব একটা ক্যাচি হেডিং করার জন্য অমলেশ ওর খবরের ঝুলিতে যা কিছু আছে সব এক জায়গায় করে নিল। সম্ভবত এই খবর অ্যাঙ্কার হবে। ছবি পাওয়া যায়নি। ফ্রন্ট পেজের বাকি অংশ সাজানো হয়ে গেছে।

অমলেশ সারাদিন ওইখানে ঘুরঘুর করেছে, দেখেছে কেমন এক চাপা উত্তেজনা অসন্তোষ এবং হতাশা জড়িয়ে রয়েছে প্রায় প্রত্যেক হকারের মুখে। ও এও লক্ষ্য করেছে ওদের মধ্যে দুটো ভিন্ন ধরনের ভাবের জোয়ার ভাটা চলছে। একটা হল, তেমন ভয়ের কিছ নেই, পুলিস জিনিসপত্র নিয়েও যাবে না, নষ্টও করবে না। অন্য ভাবটা হল, নেয় যদি।... দোকান তুলে দেবে যখন তখন জিনিসগুলো যাবে কোথায়! আসলে দিশেহারা মানুষগুলি বুঝতে পারছিল না ওরা কী করবে। তবে রুটি রুজির ব্যাপার। দোকানই যদি না থাকে ওরা খাবে কী!

এইসব ভাবনার টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে কেউ কেউ যেমন সারাদিন ধরে জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়েছে কেউ কেউ আবার নেয়ও নি। কিন্তু চাপা শঙ্কা ছিলই। একটু বেশি রাতে, রাত তখন বারোটায় অপারেশন সানশাইন-এর কাজ শুরু হয় দুদিক থেকে। শ্যামবাজার থেকে একটা দল হাতিবাগানের দিকে এগোতে থাকে। অন্য একটা দল এগোয় গ্রে স্ট্রিটের মোড় থেকে শ্যামবাজারের দিকে। সমস্ত ব্যাপারটার পরিচালনা হয়েছিল শিকদার বাগানের মুখে গড়ে তোলা কন্ট্রোল রুম থেকে। এছাড়া টাউন স্কুলের মোড়ে পুলিস এবং র‍্যাফের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল।

শ্যামবাজার মোড়ে হকার সংগঠনের সঙ্গে অন্য একদল ঝাণ্ডাধারী লোকের ভালরকমের মারপিট বাধে। ওই যে ঝাণ্ডাধারী লোকেরা তাদের পিছনে ছিল র‍্যাফ বা র‍্যাপিড এ্যাকশন ফোর্সের গাড়ি ভর্তি পুলিস। তার পিছনে ছিল তীব্র মেটাল ল্যাম্পের গাড়ি। এরপর ছিল জল কামানের গাড়ি। দুদিক থেকেই এইভাবে গাড়িগুলি পুলিস এবং জল কামান এমনভাবে এগোয় যে হকাররা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ওদের তাড়িয়ে দিয়ে মেটাল ল্যাম্পের তীব্র আলো এমনভাবে জ্বালিয়ে রাখা হয় যে পাঁচ মাথার মোড় থেকে সেই গ্রে স্ট্রিট পর্যন্ত অধিকৃত অঞ্চলে কী হচ্ছে কেউ যেন দেখতে না পারে। ওদিকে পে লোডার দিয়ে কলকাতা কর্পোরেশন এবং পুলিসের লোকেরা ফুটপাতের গজিয়ে ওঠা সমস্ত অবৈধ স্টল এবং দোকান ভেঙে ফেলতে শুরু করেছে।

এইসব খবরকেই অমলেশ যতখানি সম্ভব সাদামাটা করে অ্যাসিস্ট্যান্ট নিউজ এডিটরের কাছে পাঠিয়ে দিল। সে খবর নিউজ এডিটর হয়ে শেষ পর্যন্ত কী চেহারায় হাজির হবে তা ওর জানা নেই। কেননা খবরটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা যায় যেমন তেমনি আবার ইচ্ছে করলে খুব তরল, অনেকটা এলেবেলেও করে দেওয়া যায়। কারণ এর সঙ্গে বিভিন্ন তরফের নানা সেন্টিমেন্টের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। হকারদের দিক যেমন দেখার আছে তেমনি যারা পথচারী তাদের দীর্ঘদিনের জমে থাকা রাগ ক্ষোভের দিকটাও দেখার আছে। তারা ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে পারে না বলেই রাস্তা ব্যবহার করে, এই কারণে রাস্তায় গাড়িগুলি তাদের স্বাভাবিক গতিতে দৌড়তে পারে না। এই অবস্থা প্রায় চরম এক অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছনোর ফলেই প্রশাসনকে নড়েচড়ে বসতে হয়েছে। শাসনের দণ্ড হাতে তুলে নিতে হয়েছে। অমলেশ এই সবই বোঝে। সরকার এই কাজের ফলে অনেকের কাছে অপ্রিয়ও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কিছু কাজ আছে যা না করলে নয়, যা করতেই হয়। সে ক্ষেত্রে একটা সরাসরি সরল রিপোর্টই হওয়া উচিত। এরপরে যা হয় হোক। এ এন ই, এন ই এঁরা বুঝুন। অমলেশ খবর তুলে দিয়ে শেষ রাতে বাড়ি ফিরে গেল।

মফস্বল থেকে শোভন যখন সকালের ট্রেনে কলকাতামুখী তখন ও ওই খবর পড়ছিল। খবরের কোথাও কোনও উষ্মা ঝাঁঝ অথবা তীর লুকোনো নেই। শোভন খবর পড়ে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হল যে যাক কোথাও কোনও ঝুট ঝামেলা হয়নি। সব বেশ নির্বিবাদে ঘটে গেছে।

আজকে ট্রেনে ভিড় ছিল। শোভন বসার জায়গা পায়নি। ফলে মুখোমুখি বসা দুই সিটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাগজ পড়তে পড়তে যাচ্ছিল। একটা দুর্বার গতিময় ট্রেনে ওইভাবে গেলে ট্রেনের দুলুনির জন্য পড়ে যাওয়ার কথা। শোভন কিন্তু পড়ছিল না।

অথচ ও আশপাশের কিছু ধরেও নেই। দুহাতে কাগজ ধরা। এটা কীভাবে সম্ভব! হ্যাঁ এও সম্ভব। এই ধরনের অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে যারা শোভন সব সময় তাদের মতো নয় বটে কিন্তু আজকে কার্যকারণে সেই রকম একটা ব্যাপার ঘটে গেল। অপারেশন সানসাইনের খবর পড়ার আগ্রহ ও চাপতে পারেনি। ফলে ওর সামনে বসে থাকা লোকটার পায়ে একরকম ঠেসান দিয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। প্রায় অজান্তে। লোকটা যখন বলল, কী হচ্ছে, কী, সরে দাঁড়ান। শোভন তখন খুবই লজ্জায় পড়েছে। অথচ নড়বারও জায়গা নেই।

সাধারণত এরকম কেউ বলে না। সচরাচর সহ্য করার চেষ্টা করে। নয়তো পা একটু সরিয়ে নেয়। শোভনও তাই করে। এখনও যতটা সম্ভব হাওয়াকে আসতে দিয়ে জানলার দিকে সরে দাঁড়াল। ট্রেনে ঠাসাঠাসি ভিড়। সব বয়সের মানুষ বসে দাঁড়িয়ে গায়ে গায়ে লেগে চলেছে। যারা দাঁড়িয়ে তারা উর্ধ্ববাহু। ওপরের হ্যান্ডেল পাকড়াও করে চলেছে। এইভাবে নিত্য যাওয়া। নিত্য আসা। কিন্তু অতিরিক্ত ভিড় সহ্য করতে করতে প্রত্যেক মানুষই কিছু দোষ রপ্ত করে ফেলেছে। যেমন কনুই দিয়ে অথবা ওপরের হ্যান্ডেলটা সঠিক কায়দায় ধরে পাশের মানুষকে আটকানোর চেষ্টা করা। একটা সিট খালি পেলে যে কোনওভাবে বসার চেষ্টা করা। পাশের জনের সুবিধা অসুবিধাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সদলে তাস খেলা অথবা কুরুচিকর ইঙ্গিতময় কথা বলা।

এইসব নাগরিক আচরণ প্রতিদিন দেখতে দেখতে আগামী দিনগুলি কেমন হতে পারে ভেবে শোভনের আজকাল শঙ্কা হয়। মানুষ তো আসলে খারাপ নয়। মানুষ তো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে পরস্পরকে ভালবাসবে বলেই। মানুষ সমাজ গড়েছে। মানুষ শুধু মানুষ নয়, সারা পৃথিবীর সমস্ত জীবগোষ্ঠীর ভাল চেয়েছে। কিন্তু এখানে এই অবস্থা দেখলে মনে হয় মানুষ আসলে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বীই। মানুষ যেন এখনও তার আদিম সত্তাকে রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে। অল্প জায়গায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ের জন্যই এটা ঘটছে হয়তো কিন্তু এর থেকে বাঁচানোর কিছু একটা উপায় বের করা উচিত। সরকারের ভাবা উচিত। সমাজের যাঁরা মাথা তাঁদের ভাবা উচিত।

এইভাবে ভাবলেও শোভনের মাঝে মাঝে নিজেকেই সবচেয়ে অপরাধী বলে মনে হতে থাকে। মনে হয় এইসব বদ আচরণের জন্য ওর দায়ও কিছু কম নেই। প্রতিদিনের অজস্র অভদ্রতার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ট্রেনে বাসে রাস্তাও ও নিজেও কি কিছু কম অভদ্রতা করে ফেলে না! এই যেমন এখন, এক্ষুণি যেটা ঘটে গেল। এই ভেবে কাগজটা গুটিয়ে রাখতে গিয়ে একটা ছোট্ট খবরে শোভনের চোখ আটকে গেল।

খবরে ছিল অপারেশন সানশাইন ঘটে যাওয়ার পর মোহন বাগান লেনের উল্টোদিকের ফুটপাতে যে দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে তার আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়েছে একটা মার্বেল প্লেক। তাতে লেখা আছে এই বাড়িতে ধরা পড়েছিলেন শহিদ ধরণীধর মজুমদার। ব্রিটিশের হাতে ধরা পড়ার পর তিনি বেশ কিছুকাল ব্রিটিশের কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। বি ভি'র কাজে আমরণ যোদ্ধা এই বীর সেনার জেমস ফার্গুসনকে হত্যার জন্য ফাঁসি হয়।

খবরটা পড়ে, বারবার ঘুরে ফিরে পড়ে শোভনের যেন আশ মিটিল না। এই ধরণীধর মজুমদার যে ওর নিজের মামা। কী আশ্চর্য! শোভন জানতই না। কোন বাড়িটা, কোন সেই বাড়ি! কী আশ্চর্য, এই খবরটার সঙ্গে খুব সূক্ষ্মভাবে গোপনে ও নিজে জড়িয়ে আছে। সূত্র শুধু একটাই। সেই অসম সাহসী লোকটা ছিল ওর মামা। ওর নিজের মামা। এই কথা এই এত লোককে ওর তক্ষুণী চিৎকার করে শোনাতে ইচ্ছে করছিল। এখনি যদি সেই বাড়িতে যাওয়া যেত! কোথায় কোন বাড়িতে তিনি থাকতেন, নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, যদি দেখা যেত। বাবা বোধহয় ছোটবেলায় বাড়িটা দেখিয়েছিলেন। বোধহয় একবার বলেও ছিলেন। পরে স্পষ্ট জ্ঞান হয়ে কত কতবার ও ওই বাড়ির সামনে দিয়ে গেছে। এসেছে। কিন্তু বুঝতেও পারেনি কোন উত্তরাধিকার ও নিজে বয়ে নিয়ে চলেছে। ও বুঝতেও পারেনি। এই যে এত লোক, এরা সবাই কোনও কোনও ভাবে একেকজন বিনয় বাদল দীনেশ অথবা ধরণীধরের উত্তরাধিকারের গৌরব নিয়ে চলেছে। শুধু তেমনভাবে ফিল করেনি। করে না। কিন্তু আজকে এই মুহূর্তে শোভনদেব গুপ্ত সেই গৌরবকে মনের মধ্যে খুঁজে পেয়ে যেন হঠাৎ এক উত্তেজনায় শিহরিত।

শোভন কাগজটা ওর কাঁধে ঝোলা ব্যাগে রেখে জানলার ওপরের ক্যারিয়ারের একটা রড খামচে ধরল। দাঁড়ানোর পক্ষে এই ধারের অংশ সবচেয়ে নিরাপদ। এখানে ভিড়ের চাপ লাগেই না বলতে গেলে। এখান থেকে জানলার বাইরে তাকালে কংক্রিটের স্লিপারের ওপরে বিছানো পাশের আপ লাইনটি দ্রুত সরে যাচ্ছে দেখা যায়। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। একটা ঝিকিমিকি ভাব চোখের পক্ষে অসহ্য ঠেকে। শোভন চোখ বুজে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকল। ট্রেন তখন শিয়ালদার দিকে দ্রুত দৌড়চ্ছে।

ধরণীধরের সব গল্পই ওর জন্মের আগের। তিনি ছিলেন খুব বলিষ্ঠ দশাসই স্বাস্থ্যের মানুষ। ছ ফিটের কাছে লম্বা। গায়ের রঙ ছিল কালো। খুব চৌকস ধরনের মানুষ ছিলেন। যেমন পড়াশুনোয় তেমনি শরীরচর্চায় এবং খেলাধুলোয়। এইরকম অতুলনীয় যুবা আজকাল বাঙালির মধ্যে দেখাই যায় না। বিশেষ করে বাঙালির সেই মনোবল তো নেইই। তার উপর সেই চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং অটুট স্বাদেশিকতারও অভাব ঘটে গেছে। মেজো মামা একবার নাকি ইংরেজের হাতে ধরা পড়ার অবস্থায় গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে ওপারে চন্দননগরে চলে গেছিলেন। ভাবা যায়! শোভন সাঁতার দিতেই জানে না। খালি লম্বায় মামার বাড়ির ধরণ পেয়েছে মাত্র। তবে প্রয়োজনে ওই অনমনীয় একটা মনোভাব ওরও আছে। শুধু কিছু ব্যক্তিগত প্রাপ্তির আশায় কাউকে কুর্ণিশ করে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার মন ওর কখনই হয়নি। কিন্তু সে আর কতটুকু। শোভন বুঝতে পারে ও আসলে সুবিধাভোগী দই'এর ওপরটা খাওয়ার দলের একজন। এইসব ভেবে ওর মনে হয় ওই লোকটাকে নিজের মামা বলে পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতাও ও হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু সেই পরিচয়ই ও হঠাৎ দিয়ে ফেলল। যাঁরা ব্যস্ত, যাঁরা অফিসের সহকর্মী, যাঁরা অন্য পদাধিকারী এবং গণ্যমান্য তাঁদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছিল রাতে। সেখানে অফিসের সবাই প্রায় একসঙ্গে দল বেঁধে হাজির হয়েছিল। শ্রদ্ধা জানানোই উপলক্ষ বলে কথাটা হল শ্রাদ্ধ। তাই শ্রাদ্ধের দিনই সবাই হাজির হবে, এটাই স্বাভাবিক। নয়তো নিয়ম ভঙ্গের দিনও সুপ্রিয় সবাইকে যেতে বলেছিল। অফিসের ওরা এতে রাজি হয়নি। এখানে এসে দেখা গেল বিশিষ্টজনেরাও এদিনেই হাজির হয়েছেন।

শোভন এদিক ওদিক মাথা ঘুরিয়ে দেখল দু'একজন প্রশাসনিক অধিকর্তা, সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি যেমন আছেন তেমনি অভিনেতা, নাট্যকার, শিল্পরসিকও এসেছেন। রায় সীতারাম ছবি হয়ে যেখানে সে জায়গাটা ফুলে ফুলে ঢাকা। ধূপ জ্বলছে। এছাড়াও অন্য এক মৃদু গন্ধ বাতাসে। মনে হয় এয়ার ফ্রেশনার দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ওদিকে বিভিন্নজন নিজেদের মধ্যে গল্পে মশগুল। হাসি ঠাট্টাও চলছে। আবার ঘুরে ফিরে যারা লাইট ড্রিঙ্কস দিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে ডেকে এক আধটা নেওয়াও চলছে। চারদিকে ধবধবে সাদা কাপড়ে ঢাকা। সঙ্গে মানানসই সাদা আলো। রায় সীতারামের শেষ বয়সেও গোঁপ ছিল দেখার মতো। অনেকটা গোঁপের আমি গোঁপের তুমির মতো ব্যাপার। অনেকটা ওই গোঁপই যেন ওঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয় সঠিকভাবে দিয়ে গেছে। ছবিতেও সেই ভাব। ভারী মুখ। প্রখর দুই চোখ। দুই ঠোঁটে এমনই চ্যাটালো ভঙ্গিমা যে মনে হয় ওই মুখ বলছে এই দুনিয়াতে পরোয়া করার মতো কিছুই নেই।

শোভনরা যে কজন একসঙ্গে বসেছিল তারা সবাই কথায় কথায় ওই ছবির দিকে সপ্রশংস ভঙ্গিতে তাকিয়েছিল। ওরা ভাবছিল রায় সীতারামের কথা। তাঁর নানান ব্যক্তিত্বের কথা হচ্ছিল। তখনই হঠাৎ সুপ্রিয় সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বলল, বাই দি বাই একটা খবর পড়েছ আজকে? গাঙ্গুলি বলল, কী খবর?

শোভন বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ পড়েছি। শহিদ ধরণীধর মজুমদার ছিলেন ওই বাড়িতে।

—হ্যাঁ।

একথা বলে সুপ্রিয় একটা চেয়ার টেনে বসল। তারপর আঙুলের টোকায় সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল, বাবা খুব জাঁদরেল অফিসার ছিলেন। ধরণীধর মজুমদারও তখন খুব বিখ্যাত। তাঁর মাথার দাম ধরা হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। বাবা চারদিকে ঘিরে ফেলে তাঁকে ধরলেন। গুলি বিনিময় হয়েছিল। কিন্তু ধরণীধর শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেন।

সুপ্রিয়র এই প্রায় সুতৃপ্ত আলাপের উত্তরে সবাই যখন বিগলিত চোখে ওই ছবির দিকে তাকিয়ে ঠিক তখনই হঠাৎ নেহাৎ বেরসিকের মতো শোভন বলল, ধরণীধর নানান গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন হীরের টুকরো ছেলে। আমার খুব গর্ব কিন্তু তাঁকে নিয়ে। উনি ছিলেন আমার নিজের মামা। মেজ মামা। হঠাৎ এই কথায় সবাই সচকিত হল। সুপ্রিয়ও বলল, তাই নাকি!

সেই মুহূর্তের সেই ম্রিয়মান হয়ে যাওয়া আলো, মুখগুলি এবং স্বয়ং জাঁদরেল পুলিস অফিসার রায় সীতারামের ম্লান হয়ে যাওয়া ছবির কথা বিকাশকে আর বলা হল না। কিন্তু বিকাশকে সেই গল্পটা তখনি যদি বলা যেত। তক্ষুণি।

ছবি: অলয় ঘোষাল

http://doridro.com